তৃতীয় পর্ব : আপেক্ষিতার এই জগৎ এবং আইনস্টাইন!

'সুন্দরী মেয়েদের সাথে দুঘন্টা কাটে দুই মিনিটের মতো, জ্বলন্ত উনুনের পাশে দুমিনিট মনে হয় দুই যুগ! সংক্ষেপে এই হল আপেক্ষিকতা'

–আইনস্টাইন

চিত্রপট ১ : তিনি তখন পেটেন্ট পরিক্ষক!

আইনস্টাইনকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এতো লেখালেখি হয়েছে, নতুন কিছু লেখা বেশ কঠিন। তবুও এই কঠিন কাজটিই করে দেখিয়েছেন অভিজিত তৃতীয় অধ্যায়ে। আইনস্টাইনের সাধারন এবং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে একদম সাধারণ ভাষায়—সহজ সরল উদাহরন সহযোগে। অভিজিতের ভাষা এই অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার এক উজ্বল সংযোজন।

আপেক্ষিকতার সাথে আমাদের নিত্যদিনের ওঠা বসা। এই যে ধরুন যেসব বাঙ্গালীকে, কোলকাতাতে বড়সড় চেহারার মনে হয় এই হ্যামবার্গারের দেশে তাদের নেহাতি সাধারন চেহারার মনে হবে। আবার ইটালী থেকে ঘুরে আসার

পর, যেসব বাঙালী মেয়েকে সুন্দরী বলে মনে হতো, তাদের সুন্দরী বলে ভ্রুম হতে পারে! আমাদের উপলব্ধির এই জগৎ - যেখানে বড়, ছোট, লম্বা বেঁটেদের নিয়ে আমাদের নিত্যদিনের আলোচনা, তা আসলেই অন্যকিছুর সাপেক্ষে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের এই জগৎ মানব সভ্যতার ইতিহাসে, বৃহতম আবিস্কার। স্থান কাল ভরের এই জগৎকে আমরা যেমন দেখি, আইনস্টাইন দেখালেন সেটা আসলে মায়া। বস্তু এবং শক্তি আসলে একই সত্তা। স্থান এবং কাল আলাদা নয়। তারা একই সূত্রে বাঁধা।

আইনস্টাইন এই সৃজনশীল কাজকর্মের সময়কাল ১৯০২-১৯০৯। স্থান বার্নে সুইস পেটেন্ট অপিস। আট ঘন্টার কাজ, দূই ঘন্টায় শেষ করতেন। বলতেন, জুতোপালিশের চেয়েও সোজা কাজ পেটেন্ট পরিক্ষকের। ১৯০৪ সালে তার চাকরী স্থায়ী হলো-মাইনে ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে বেশী। আজীবন পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন, এবং শিক্ষকের কাজ খুঁজতে গিয়ে, ছমাস অনাহারে কাটিয়েছেন। সেটা ১৯০১ সাল। পেটেন্ট অপিসের কাজে মিলল কাজের জন্য অফুরন্ত সময় আর ভালো মাইনে। এতএব একই সাথে দুটি বিষয়ের ওপর কাজ শুরু করলেন। প্রথম কাজ তরলের অনুদের ব্রাওনিয়ান গতিবিদ্যা নিয়ে। এইটিই ছিলো তার পি এচ ডি থিসিস। দ্বিতীয়টি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে। যা নিয়ে ১৬ বছর বয়স থেকে ভাবছিলেন, ২৬ বছর বয়সে পূর্ণতা এলো জার্মান জার্নালে প্রকাশিত 'চলন্ত বস্তুর তড়িৎগতিবিদ্যা' নামক পেপারে।দুই মাস বাদেই একই জার্নালে আরো একটি পেপার 'ভর কি শক্তির উপর নির্ভরশীল?'। প্রমান করলেন m ভরের বস্তু আসলে mc^2 শক্তির (যেখানে c হচ্ছে শুন্যে আলোর গতিবেগ) একটি সত্তা! এই পেপার হচ্ছে আনবিক বোমার প্রথম তাত্ত্বিক ধারণা।১৯০৫ আসলে এক কাল্পনিক অধ্যায় আইনস্টাইনের জীবনে।

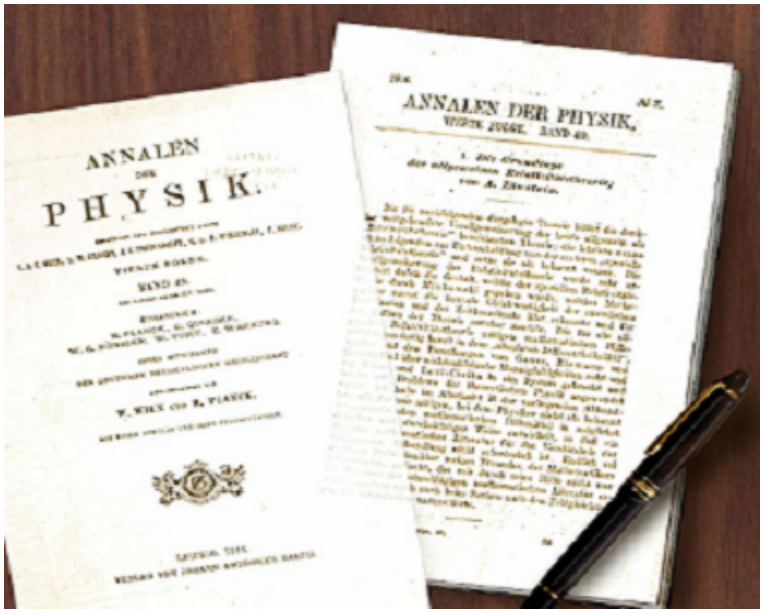

চিত্রপট২ :আনালেন ফীজিকে আইনস্টাইনের ঐতিহাসিক পত্র

১৯০৭ সালে প্রথম বিশেষ আপেক্ষকতাবাদকে, অভিকর্ষে কাজে লাগালেন। এরপর আরো দশ বছর লাগলো, সাধারন আপেক্ষিকতাবাদের জন্ম দিতে।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সাথে নিউটনের অভিকর্ষের তত্ত্বের একটি মূল পার্থক্য হলো, আলোর সাথে বস্তুর অভিকর্ষজ আকর্ষন। এই আকর্ষন খুবই দুর্বল । এত দুর্বল যে নিউটনিয় তত্ত্বে এর মান শূন্য! আইনস্টাইনের তত্ত্বে, দেখা যায় এই মান শূন্য নয়, তারাদের মতন বৃহৎ ভরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সামান্য হলেও আলোরা বেঁকে যায়! ১৯১৯ সালের সূর্য্যগ্রহনে ধরা পরল এই সামান্য বাঁক—পরের দিন লন্ডন টাইমস লিখছে
বিজ্ঞানে মহাবিপ্লব-এই মহাবিশ্বের নতুন তত্ত্ব । নিউটন সিংহাসনচ্যুত।
অভিজিত এই অধ্যায়টি বিশদভাবে তার বইয়ে লিখেছেন।

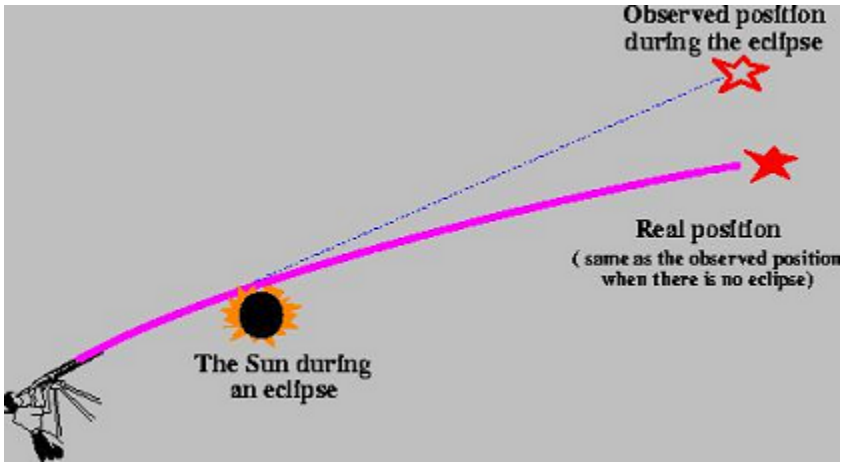

চিত্রপট ৩: আইনস্টাইনের সাধারন আপেক্ষিকতাবাদের ওপর এডিংটনের পরীক্ষা

চিত্রপট ৪: এডিংটন টেলিগ্রাম করে আইনস্টাইনকে জানালেন, পরীক্ষা সফল!

১৯২১ সালে ফোটোইলেক ট্রিক এফেক্ট এর জন্যে নোবেল পেলেন—স্টার্নের মতন ইহুদী বিদ্বেশী জার্মান বিজ্ঞানীরা, আইনস্টাইনকে জার্মান বিদ্বেশীবলে

ঘোষনা করলেন। মূল কারন জার্মানীতে জন্ম হলেও, আইনস্টাইন জার্মান নাগরিকত্ব প্রত্যাখান করে সুইস নাগরিকত্ব নেন ১৯০১ সালে। আজীবন সুইস

নাগরিক ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর যুদ্ধবাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন।

১৯২৭ সালে সলভে কনফারেনসে, হেইসেনবার্গ, ডিরাকের সাথে তার মতপার্থক্য হেলো। ১৯০২ সাল থেকে তিনিও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিয়ে গবেষনা করছেন, কিন্ত হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার তত্ত্ব মানতে পারলেন না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সম্ভবনার তত্ত্বকে ধাপ্পাবাজি বললেন।

হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতায় আসার পর, জার্মানী থাকা আর সম্ভব ছিল না। ১৯৩৩ সালে চলে এলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে—বাকী জীবন কাটালেন অভিকর্ষ আর কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে এক সূত্রে গাঁথতে। আমেরিকাতে তার সব চেয়ে বিখ্যাত কীর্তি ২শরা আগস্ট রুসভেলট কে লেখা চিঠি-যাতে আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে জানালেন, ওহে এবার আনবিক বোমা বানাও-হিটলার অনেকটা এগিয়েছে। একবার হাতে পেলে, তোমরা সমূলে বিনস্ট হবে! শুরু হয় ম্যানহাটন প্রোজেক্ট, যার ফলশ্রুতি হিরোসিমা-নাগাসাকি। আইনস্টাইন কিন্ত জাপানে বোমা ফেলা সমর্থন করেন নি। তীব্র প্রতিবাদ জানালেন ১৯৪৭ সালে

এই মহাবিশ্বের প্রাথমিক বলগুলি (পরুন নিউক্লিয়ার ফোর্স), জাতিয়াতাবাদের সংকীর্ন মনোবৃত্তির জন্যে বলি প্রদত্ত নয়।

এবার আবার ফিরে আসি আপেক্ষিকতাবাদে। আপেক্ষিকতা অভিজিত অনেক উদাহরন দিয়ে বুঝিয়েছে। আমি একটু দার্শনিক দিক নিয়ে আলোকপাত করি।

আপেক্ষিকতা বুঝতে গিয়ে প্রথমে আমরা স্থান আর কালকে বোঝার চেস্টা করি। ধরুন আপনার বাড়িতে কাওকে নেমতন্ন করেছেন—বাড়ীর ঠিকানা দিচ্ছেন। বাড়ীর ঠিকানা কি ভাবে দিয়ে থাকেন? প্রথমে বলবেন বাড়ীর কাছের দ্রস্টব্য স্থানটির কথা। যেমন আমি ডিজনিল্যান্ডের কাছে থাকি, প্রথমেই বলি ডিজনিল্যান্ডের কথা-ডিজনিল্যান্ড পর্যন্ত আগে এস। তারপরে ডিজনিল্যান্ড থেকে এতো মাইল উত্তরে, সেখান থেকে এতো মাইল দক্ষিনে!

স্থান মানে হচ্ছে ঠিকানা। ঠিক যে ভাবে বাড়ীর ঠিকানা আমরা দিয়ে থাকি, সেই ভাবেই ঠিকানা দেওয়া হয় দ্রুত ধাবমান ইলেকট্রন, প্রোটন থেকে শুরু করে গ্রহ, নক্ষত্রদের। এইযে দ্রস্টব্যস্থানের কথা বলা হচ্ছে, গনিতের ভাষায় তাকে বলে মূলবিন্দু (Reference point)। আর ঠিকানা দিতে দরকার, একটি ভাষা যাকে

বিজ্ঞানে স্থানাঙ্ক বলে। এই ভাষা অনুযায়ী, ঠিকানা বা একটি বস্তুর স্থান মানে হলো একটি মূলবিন্দু এবং তার থেকে বস্তুটির অবস্থান—যা তিনটি স ংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়— উত্তর-দক্ষিনের দূরত্ব, পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব এবং ওপর নিচের দূরত্ব।

প্রশ্ন উঠবে স্থানের সাথে আবার কালের বা সময়ের কি সম্পর্ক? সম্পর্ক আসলে নিবিড়তম। এইযে বস্তুর গতিশীলতা, সেটা আসলে, সময়ের (কাল) সাথে সাথে স্থান পরিবর্তন। এই পর্যন্ত ব্যাপারটা, নিউটনই বলে গেছেন।

গোল বাধে যখন, বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি হবে।
মাইকেলসন মর্লি প্রমান করেছিলেন মহাশূন্যে আলোর বেগ ধ্রুবক-প্রায় ২,৮৫০০০০০০ মিটার প্রতি সেকেন্ডে। ধ্রুবক মানে নিত্য-এর মান মহাবিশ্বের যেখান থেকেই মাপুন না কেনো, যতো খুশী জোরে চলতে চলতে আলোর গতি মাপুন-সেই একিই মান। এবার ধরুন দুটো ইলেকট্রন একে অন্যের দিকে ধাওয়া করছে এই বেগে। আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আমরা যদি ৭০ মাইল বেগে গাড়ী চালাই, আর উলটো দিক থেকে আরেকটা গাড়ী ৭০ মাইল বেগে আসে, তাহলে আমরাএকে অপরের দিকে ৭০+৭০=১৪০ মাইল বেগে এগিয়ে যাবো। এরম কিন্ত ঘটবেনা ইলেকট্রনের বেলায়। দুটো ইলেকট্রন প্রায় আলোর বেগে একে অপরের দিকে এগোলে, একে অপরকে সেই আলোর বেগেই কাছে এগিয়ে আসতে দেখবে। আলোর দ্বিগুন বেগে তারা একে অপরের দিকে এগোবে না!
কোনো আবিস্কারই হাওয়া থেকে আসেনা, বা স্বর্গের পরীরা অবতারদের মতো বিজ্ঞানীদের কানে কানে গোপনে বলে দেয় না! আইন স্টাইনের এই আবিস্কারের ভিত্তিভূমি মূলত তিনটি আবিস্কার।১৮৮৮ সালে, ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের সমীকরন দিলেন-যার থেকে তাত্ত্বিক ভাবে বেড়িয়ে এলো যে আলোর গতি সর্বত্র সমান! মাইকেলসন মর্লি এটাই পরীক্ষা করে দেখালেন ১৮৯৮ সালে। ১৯০২ সালে দেখা গেলো, ইলেকট্রনের গতি আলোর কাছাকাছি এলে, ইলেকট্রনের ভর বৃদ্ধি পাচ্ছে।ম্যাক্সওয়েল সমীকরনে আপেক্ষিকতাবাদ অহল্যার মতো পাথর হয়ে লুকিয়ে আছে, যা আইনস্টাইনের স্পর্শে প্রাণ পেলো।

সাধারন আপেক্ষিকতাবাদ থেকে আরো কিছু উত্তেজক সিদ্ধান্তে আসা যায়। যেমন সময়ের বৃদ্ধি। আপনি যত জোরে চলবেন, আপনার ঘরি তত আস্তে চলবে। আপনি বলবেন তাহলে প্লেনে চলার সময় ঘরি আস্তে চলে না কেনো? আসলে আস্তেই চলে, তবে, এই আস্তে চলার মান খুব ছোট-১০ লক্ষে এক ভাগ। মানে ১০০ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আপনি প্লেনে চললে, আপনার ঘরি এক সেকেন্ড স্লো যাবে! এই মান এতো ছোট, যে সাধারণ ঘরি সুধু এক বার বিমান যাত্রায় এর টিকিও খুঁজে পাবে না! তবে আনবিক ঘরি, এই ছোট সময় মাপতে পারে—১৯৬৬ সালে একটি আনবিক ঘরি পুর্ব থেকে পশ্চিমে উড়ল, আরেকটি পশ্চিম থেকে পূবে! একটি আরেকটির সাপেক্ষে স্লো হল-একদম আইনস্টাইনের সমীকরনের নির্ভূলতায়।

আরেকটি মজার সিদ্ধান্ত দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি! ব্যাপারটা মজার। ধরুন লস এঞ্জেলেস থেকে প্লেনে নিউইয়ার্ক যাচ্ছেন। দুরত্ব প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার। কিন্ত আপনি যেহেতু প্লেনে যাচ্ছেন, আপনার গতি পৃথিবীর ঘূর্ন ন গতি+প্লেনের গতি, যার মান ৩০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে। এই গতিতে চললে, আপনি দেখবেন, লস এঞ্জেলেস থেকে নিউইয়ার্কের দূরত্ব কমে গেছে! কতটা কমবে? মাত্র ২৫ মাইক্রোমিটার- হাঁ, ৫০০০ কিলোমিটারে, মাত্র ২৫ মায়ক্রোমিটার,চুলের যতটা বেধ ততটা! দৈর্ঘের হ্রাস বৃদ্ধি কিন্ত মহাকাশ গবেষনায় নিত্য নৈমাত্তিক-নক্ষত্র থেকে যে আলোর বিকিরিত হয়, তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে হ্রাস বৃদ্ধি পায়। এই হ্রাস বৃদ্ধির মান, নক্ষত্রদের গতিবেগের উপর নির্ভরশীল।

এরপরে আছে ভরের বৃদ্ধি। জোরে চললে ভর বৃদ্ধি পায়। সাইক্লোট্রনে, যেখানে ইলেক্ট্রন প্রোটনদের ভেঙে ফেলে আলোর কাছাকাছি বেগে ছোটানো হয়, সেখানে এই ঘটনা অহরহ ঘটছে-আইনস্টাইনের নিয়ম মেনেই ঘটছে।

সাধারন আপেক্ষিতাবাদ একটু জটিল। মোদ্দা বক্তব্য হল বস্তুর ভরে, তার আশেপাশের স্থান কালের বক্রতা তৈরী হয়। এর সপক্ষে বেশ কিছু পরীক্ষালব্ধ প্রমান মিলেছে। ১৯১৯ সালের পরীক্ষার কথা আগেই বলেছি। এছারা বুধের অবঘুর্ননের (Precision) মান নির্ভুল ভাবে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকেই আসে। অবঘূর্ননের সাথে আমাদের সবারই পরিচয় লাট্টুর ঘূর্নন থেকে। লাট্টুর ঘোরা যখন শেষের দিকে, তখন লাট্টুর মাথা টলকাতে থাকে। গ্রহদেরও এই রকম মাথা টলকায় যা নিউটন দেয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। শুধু বুধের মাথা ঘোরা হিসাবে মিলতো না। সাধারন আপেক্ষকতাবাদ কিন্ত বুধের এই মাথা ঘোরার নির্ভুল হিসাব দেয়। সাম্প্রতিক কালে পালসার থেকে আলোরা যে বেঁকে বেড়োয় তার প্রমান মিলেছে। এ সবই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ফসল!

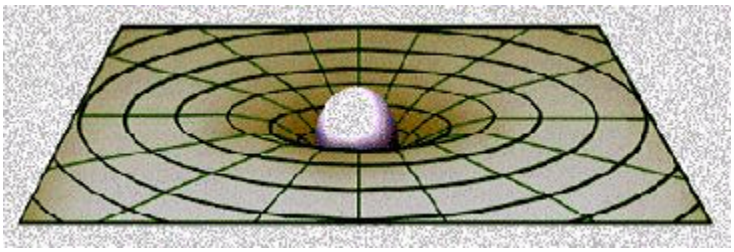

চিত্রপট ৫ : ভরের জন্য স্থান কালের বক্রতা

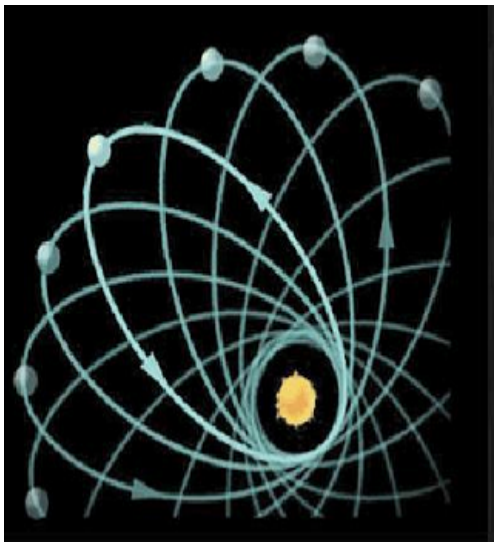

চিত্রপট ৬ : শিল্পীর কল্পনায় বৃত্তের অবঘূর্ন

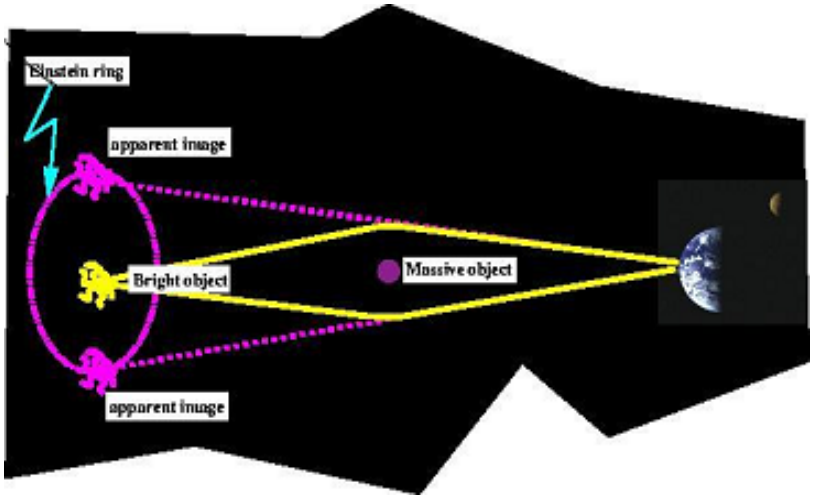

চিত্রপট ৭ : আইনস্টাইনের বৃত্ত: ম হা কর্ষজ লেন্সের ধারনা

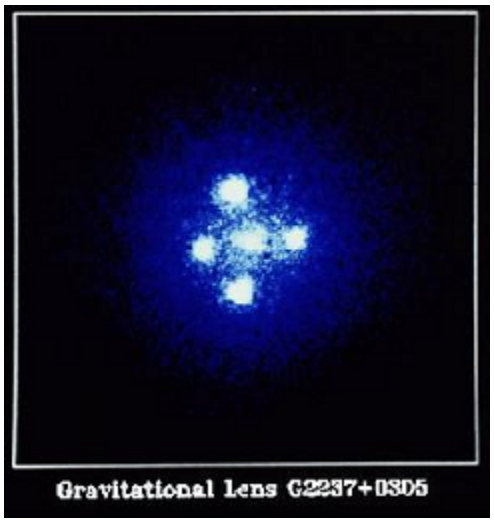

চিত্রপট ৮ : কোয়াসারের থেকে বিকিরিত আলো–আইনস্টাইনের বৃত্তকে দেখা যাচ্ছে

এই অধ্যায়ে পাঠকের প্রাপ্তি আপেক্ষিকতার অনেক উদাহরন, আর সাবলীল, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা।